আমি

গৌর বৈরাগী

সন ১৯৫৭। হাঁটিবার জন্য মাটির রাস্তা। খাইবার জন্য রেশনের চাল। পানের জন্য পুকুরের জল। মায়ের সাজিবার জন্য সুবাসিত তরল আলতা ও সিঁদুর। রাঁধিবার জন্য একটি মাটির উনান। একটি লোহার কড়া ও চাটু। কানা উঁচু কলাইকরা ডিস এবং ডেকচি। ভাতের হাঁড়িটিও ছিল মাটির। এগুলিই ছিল মায়ের সঙ্গী, প্রিয়জন। তখন পনেরো ঘন্টার দিন ছিল। তাহার মধ্যে বারো ঘন্টা মায়ের সঙ্গী হাঁড়ি কড়াই।

পাঁচটায় ঘুম ভাঙার পর ঘর ঝাঁট, উঠান ঝাঁট, জল ছড়া, বাসন মাজা। ঠিক ছ-টায় উনানে আঁচ পড়িত। প্রথম হইত চা। কড়াটিও ছিল মাটির। এক কড়া পুকুরের জল তাতে ভেলি গুড় পরিমাণ মতো, একটু নুন আর তেজপাতা, চা এক চামচ।

সকাল সাড়ে ছ-টায় মায়ের হাত হইতে এক বাটি চা ও দুইখানা বাসি রুটি লইয়া দিন শুরু হইত।

পাখি ডাকিতেছে। শালিক, চড়ুই, ছাতারে, তালগাছে বাবুই পাখিও সুর করিয়া যেমন কথা বলিতেছে। দাদামণির বড় সজিনা গাছে খুব ফুল আসিয়াছে। উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া মা চুপড়ি লইয়া ফুল কুড়াইতে গেল। এক পেতে ফুল হইলে আলু দিয়া একটি তরকারি হইবে।

দাদামণি ঘর হইতে বলিল, কে ওখানে!

মা বলিল, আমি দুটো ফুল কুড়ুচ্চি।

ঠিকাচে, একপেতে আমাদের দিয়ে যেও।

আচ্ছা। বলিয়া মা ফুল কুড়াইতেছে। মাঝে মাঝে ঘোমটা চানিতেছে। আঃ ফুসের কী সুবাস। ভারী ঠান্ডা ঠান্ডা, বেশ শিশির শিশির গন্ধ সজিনা ফুল। ফুলের বৃন্তে সুতোর মতো ডাঁটা আসিয়াছে। মা বলিল, বেশ হবে, ঝাল চচ্চরি। এক থালা শুধু ফুল দিয়ে।

শুধু ফুলই বা কেন। কালো মাসি কাল একটি কচি লাউ দিয়াছে। আর মায়ের হাতে তৈরি বড়ি। সেই বড়ি ভাঙা দিয়া লাউ ঘন্ট।

গোরা, এই গোরা।

আমি বলিলাম, কী!

তোর ছেলে দুটো পয়সা দিয়ে গে চে মাচের। তুই আনতে পারবি বাবা।

না, পারব না।

এমন সোজা উত্তর মাকে ছাড়া আর কাহাকে দেওয়া যায়।

তখন দাদাকে বলিল, বিজু ও বিজু। দু পয়সার চুনো মাচ!

দাদা বলিল, আমি পড়চি, পারব না।

তখন ঘোমটা টানিয়া পাড়ায় শৈল ঠাকুরপোকে ধরিল মা। ঠাকুরপো, দু পয়সার চুনো মাছ এনে দেবে?

ভাত ফুটিতেছে। রেশনের চালের চমৎকার দুর্গন্ধ ভাত হইতে নির্গত হইয়া ঘর, দুয়ার তারপর উঠান পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

ঠাকুরদার আফিমের ঘুম। বেলা করিয়া ভাঙে। সকাল আটটা হইবে। একটিও দাঁত নাই বলিয়া মাজিবার দরকার হয় না। মুখ ধুইয়া গামছায় মুখ মোছা শেষ হইলেই সামনে এক গেলাস চা চাই। সকালের চা গরম করিয়া মা হাজির।

হাতে চায়ের গেলাস লইয়া এসময় প্রতিদিন পরপর কটি প্রশ্ন রাখিবে ঠাকুরদা। এক নম্বর প্রশ্ন: আজ কী রান্না হচ্ছে বউমা।

মা: সজনে ফুলের চচ্চড়ি।

ঠাকুরদা: বাঃ তারপর।

মা: বড়ি দিয়ে লাউ ঘন্ট।

ঠাকুরদা: বাঃ বাঃ। তারপর!

মা: চুনো মাঝের ঝাল চচ্চড়ি।

ঠাকুরদা: বাঃ বাঃ বাঃ। তারপর ডাল হবে না।

মা: আবার ডাল কী হবে বাবা। লাউ ঘন্ট দিয়ে ভাত মাখা হয়ে যাবে।

একজন ভিখিরি আসিল। বলিল, মা দুটি ভিক্ষা পাই!

তখন ভিখিরিরা সাধু ভাষায় কথা বলিত। যেমন পানের জন্য এক পাত্র জল পাইব! কিংবা মা, আজ দুটি সেবা করিতে চাই!

তখন সব মায়েদের মতো আমার মাও খুব দয়ালু ছিল। বলিত, বেশ তো, দুপুরে আসবেন। সেবা করে যাবেন।

এরপর দুপুরে যখন ভিক্ষুক মানুষটি সেবা শেষ করিল তখন ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। এবার মা খাইতে বসিবে। ভাত আর ফুলভাজা। লাউঘন্টা ভালো হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুরদাকে আরও দুই হাতা ঘন্ট দিয়াছে। মায়ের

খাওয়া শেষ হইল যখন তখন বেলা তিনটা । শুরু হইয়াছিল সাড়ে নয়টায়।

আমাদের ইশকুল দশটায়। বাবা চটকল থেকে এক শিফ্‌ট্‌ অর্ধেক করিয়া ফেরে সাড়ে দশটায়। শেষ হইবে পাঁচটায়। তাই খাওয়া শেষ করিয়া গা হাত ধুইয়া মাকে উনান ধরাইতে হয় বেলা সাড়ে চারটেয়। সাড়ে পাঁচটায় বাবার সঙ্গে আমরাও রুটি আর কুমড়ার তরকারি খাইব।

চার ভাই বোন। প্রতিদিন তিরিশ খানা রুটির দরকার। সঙ্গে পরিমাণ মতো কুমড়ার ঘ্যাঁট। প্রতিদিন পাঁচটা থেকে সাতটা বেলুন চাকি চাটু আর খুন্তি লইয়া ব্যস্ত থাকিত মা। সামনে কুপি জ্বলিত। কেরোসিন কুপির দপদপে শিখায় মা রুটি বেলিতেছে। চুড়ি বাজিতেছে রিনঠিন। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'য়টায় হরিসভায় নাম আরম্ভ হইল। মা জোড় হাতে নমঃ করিল।

একটি মাত্র হ্যারিকেন ঘিরিয়া আমি দাদা আর বোন। কোলের ভাইটি ইশকুলে ভর্তি হয়নি। দাদা মোগল সাম্রাজ্যে বিচরণ করিতেছে। আমি ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে ক্রমশ সমতলে নামিয়া আসিতেছি। মা ডাকিল, খাবি আয় তোরা।

রাত আটটা। গভীর রাত। শিয়াল ডাকিতেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা স্বর বাতাসে ভাসিতেছে। একটি ‘বউ কথা কও’ আমডালে বসিয়া ডাকিয়াই চলিয়াছে। বাবা হরিসভায়। রাত নটায় আসিবে। আমরা রুটি খাইতেছি। রাত আটটার পর আলো নিভিয়া যাইবে। তার আগেই মেঝের বিছানায় আমি আর দাদা শুইয়া পড়িলাম। বোন এবং ছোটভাই মায়ের পাশে তক্তোপোষে শুইবে। বাবার আলাদা বিছানা দাওয়ায়। বাবা একা একা শোওয়া পছন্দ করে।

পাতলা কাঁথায় শীত কাটিতেছে না। তাই চোখে ঘুম নাই। আকাশে একটি বড় চাঁদ উঠিয়াছে। দেখিতেছি তরল আলতায় পা দুটি রাঙা করিতেছে মা। পারা ওঠা আয়না চাঁদের আলোয় মুখে ধরিয়াছে। খুব যত্ন করিয়া কপাল এবং সিঁথিতে সিঁদুর দিতেছে। আমার ঘুম আসিতেছে না। সেদিন বুঝি নাই। আজ বেশ বুঝিতে পারি। ওই রাতে পঞ্চম সন্তানটি গর্ভে ধারণ করিবার জন্য মা নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল।

আমার বাবা

সন ১৯৫৭। সামনের মাটির রাস্তা দিয়া বাবা ভোর পাঁচটায় হাঁটিয়া যাইত। দুই মাইল পথ পার হইয়া বাবার চটকল। আট হাতি ধুতি, নীল হাফ শার্ট আর পায়ে থাকিত টায়ার কাটা চটি। বাবা পাট ঘরের মিস্তিরি। হাতিকল তাহার মধ্যমা এবং অনামিকা খাইয়া ফেলিয়াছিল। সবাই বলাবলি করিত, খুব জোর বাঁচিয়া গিয়াছে সতীশ। হাতিকল কত মানুষকে যে পুরো খাইয়া ফেলিয়াছে।

ভাগ্যিস খায় নাই। তাই বাবা হপ্তা শেষ হইলে চোদ্দ টাকা বারো আনার টিকিট পাইত। ওই একটি দিন আমরা বাবার মুখ কিছু প্রসন্ন দেখিতাম।

দাদা বলিত, এবার পুজোয় আমার কাবলি জুতো চাই।

বাবা বলিত, হবে হবে। পুজো তো এখনও অনেক দেরি।

আমি বলিতাম, বাবা এবার আর দড়িবাঁধা পেনটুল নয়। এবার আমার ইংলিশ প্যান্ট চাই।

বাবা প্রসন্ন গলায় বলিত, বেশি বাবুগিরি ভালো নয়

ইংলিশ প্যান্টের দাম দেড় টাকা। দড়িবাঁধা পেনটুল বারো আনা। সরষের তেলের সের আট আনা। জবাহর আটা দু আনা সের। তিন আনা সেরে ভালো মুসুর ডাল পাওয়া যাইত। নুন ফ্রি।

শনিবার শনিবার মুদিখানার মাল আনিত বাবা। দোকান হইতে ফিরিয়া দাওয়ায় চুপচাপ বসিত। আমি স্পষ্ট দেখিতাম, বাবার গরম নিঃশ্বাস পড়িতেছে, মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। গলা ঘড় ঘড় করিতেছে। সেই গলা ফাটিত একটু পরে।

এবার আর গাণ্ডে পিণ্ডে খাওয়া চলবে না। বাবা বলিতেছে। রুটি গোনাগুনতি। ডালে বেশি করে জল দেবে। এক পো ডালে হপ্তা চালাতে হবে। তেলও বেশি খরচা হচ্ছে। আমি আর পারব না। আটার দাম সেরে দু'পয়সা বেড়ে গেল।

এসময়, এই সন্ধ্যার সময় দাদা আরও বেশি বেশি করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের অন্দর মহলে প্রবেশ করিত। আমি অঙ্কে এমনিতেই কাঁচা। তার ওপর দাওয়া থেকে আসা গরম ভাবে তৈলাক্ত বাঁশ আর বাঁদর লইয়া গলদঘর্ম হইতেছি। ওদিকে উনানে মায়ের রুটি গেল পুড়িয়া।

বাবা বলিল, যাঃ পুরো একটা পয়সা পুড়ে গেল !

মানুষটি রাগিয়া গেল। কিংবা বলা যায় বাবা সবসময় রাগিয়াই থাকিত। পরার জামাটি খুঁজিয়া পাইতেছে না। বাবা রাগ করিল। টায়ার কাটা চটিটি চটির জায়গায় নাই। বাবা রাগিয়া আগুন। দ্বিতীয় বার পাতে ভাত দিতে গিয়া মা হয়তো একটু বেশি পরিমাণ ভাত ঢালিল। এতে বাবা কথা না বলিয়া লাল চোখে শুধু তাকাইল।

বাবা বাড়িতে আসিলে কথা বন্ধ হইয়া যাইত আমাদের। হাসি বন্ধ হইয়া যাইত। মা গলা তুলিয়া কাঁদিতেও পারিত না। আমরা গলা তুলিয়া পড়িব তেমন সাহসে কুলাইত না। সকলেই খুব চুপচাপ শান্ত।

বাবা সবসময় ভাবিত বাড়িতে সাত সাতটি পেট। সকাল হইলেই দেড়সের চাল চাই। এক ছটাক মুসুর ডাল। দুপয়সার গুড়। তিন পয়সার তেল। এক আনার কাঁচা বাজার। দু পয়সার মাছ।

ঘরের দরজাটি ছিল কাঁঠাল কাঠের। তাহাতে বাবার হাতে করা কালো রঙ। চটকল হইতে মার্কা দেওয়ার বাতিল চক আনিত বাবা। দরজার উপর হিসাব লেখা হইত। বাবার লেখাপড়া বলিতে ওইটুকু। পড়াশুনার সঙ্গে আর

কোনো সম্পর্ক ছিল না। বছরে মায়ের কাছে একবার শুনিত আজ ইশকুলে ওঠা-উঠি।

ওই একদিন বাবা আগ্রহী হইয়া উঠিত। আমাদের শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত, না উঠতে পারলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দোব। এটা বলার কারণ আছে। আমার বোন ক্লাশ থ্রি-তে উঠিতে দুইবার; এবং দাদার ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত আসিতে একবার ওঠা আটকাইয়া যায়।

তাতে অবশ্য বাবা পরে বেশ খুশিই হইয়াছিল। সে বছর দাদার নতুন বই-এর জন্য টাকা খরচের দরকার হয় নাই।

এই বাবা একদিন হঠাৎ অন্য একটা কাণ্ড ঘটাইয়া ফেলিল। আমার জ্বর হইয়াছে। কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি। সুশীল ডাক্তারের হোমিওপ্যাথি গুলি খাইতেছি। জ্বর বাড়িতেছে। একদিন রাত দুপুরে জর কমাইতে মাথা ধোয়াইতে হল। সাতদিন বাদে জ্বর ছাড়িল তখন মুখে রুচি নাই।

সন্ধ্যা বেলা বাবা দোকান হইতে ফিরিল হাতে কোয়ার্টার পাঁউরুটি লইয়া। মা বলিল, পাঁউরুটি কী হবে?

বাবা বলিল, গোরা খাবে। দু পয়সা দিয়ে কিনলুম।

১৯৫৭ সালের এক সন্ধ্যায় প্রথম দুধ পাঁউরুটির স্বাদ টের পাইয়াছিলুম। সেদিন বুঝিতে পারি নাই। ওই স্বাদটুকু সারাজীবন আমাকে বহন করিয়া যাইতে হইবে।

আমাদের বাড়ি

সন ১৯৫৭। আমার বয়স দশ বৎসর। আমার মনের বয়স এক। ছোট ছোট দুইটা পাখনা গজাইতেছে। উড়িতে উড়িতে বাড়ির বাহিরে আসিলাম। ভিতরে থাকিলে তেমন করিয়া ভিতরটি দেখা যায় না, যেমনটি দেখা যায় বাহির হইতে।

গানদাদুর জামরুল গাছে ফুল আসিয়াছে। ইহাকে জামরুল গাছ বলে। আমি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া বাড়ির দিকে চাহিলাম। দুই চোখ মেলিয়া দেখিতেছি। এই আমাদের বাড়ি! ইঁট বাঁধানো উঠোন। মুখোমুখি দুইটি ঘর। পাঁচ ইঞ্চির দেওয়াল। পলেস্তারা চুন বালির। চুন বালি খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। উঠোনে তোলা উনান। মাঝে মাঝে তোলা উনানে কাঠের জ্বালে রান্না হয়।

১৯৫৭ সাল মনের বয়স এক বছর। আর ২০০৭ সালে মনের বয়স পঞ্চাশ পুরিয়া গেল। এক বছর বয়েসে বাড়ির বাহিরে আসিয়া যেমন দেখিয়াছি আজ তাহা আরও স্পষ্ট আরও নিঁখুত রূপ লইয়া চোখের সামনে আসিতেছে।

ওই তো ঘরের পুব দেওয়ালে কুলুঙ্গি। মায়ের ইতুর সড়া। গাছগুলি ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। সড়ায় সিঁদুরের ফোঁটা। লাল পাড় মোটা শাড়িতে গলবস্ত্র মা জোড় হাতে মন্ত্র বলিতেছে। পাশেই একটি তিন ফুটি জানালা দিয়ে আলো আসিতেছে। গাছগুলির আলোর দিকে যাইবার কী আপ্রাণ চেষ্টা।

কাঠের জানালা, কাঠের গরাদ। ওই গরাদে ছুরির ধার পরীক্ষা করিতে করিতে গরাদটি একদিন ভাঙিয়া গেল। বাবা মাপ মতো একটি বাঁশের বাঁখারি ছুলিয়া গরাদের জায়গায় লাগাইয়া দিল। আশ্চর্য ওই তো সেই বাঁশের গরাদ।

মাথার ওপর টালি। চালের আড়ার বাঁশটিতে ঘুণ ধরিয়াছে। বাবা কতদিন বলিয়াছে, এই বর্ষায় আড়াটি বদলাতে হবে। যে কোনোদিন মাথার ওপর ভেঙে পড়বে নইলে।

কিন্তু কাজটি আর হইয়া ওঠে নাই। ওপরে তাকাইয়া দেখি, ওই তো সেই ঘুণ ধরা আড়া। আশ্চর্য এতদিন ধরিয়া ওই দুর্বল মাথা লইয়া হাঁটিয়া আসিলাম!

তখন কে যেন বাহির হইতে বলিল, মা দুটি ভিক্ষা পাই?

এই সেই কণ্ঠস্বর যা ভিখিরি। আমাদের ভাঙাচোরা বাড়ির আগড়ের কাছ হইতে ভাসিয়া আসিল। সেই দূর অতীত হইতে আজও বুঝি কাতর ডাকটি শুনিলাম।

হাঁড়ির চাল তলানিতে। আজ আমাদের ভাতের হাঁড়ি অর্ধেক ভরিবে।

মাকে বলিলাম, যাই বলে আসি। আজ চাল নেই।

মা বলিল, ছিঃ। গেরস্থ বাড়িতে 'নেই' বলতে নেই। বলে এসে, আজ চাল বাড়ন্ত।

বৃদ্ধা বাটি হাতে কাতর দাঁড়াইয়া ছিল আমাদের বাড়ির সামনে। কথাটা তাহাকে জানাইতে সে 'ও' বলিয়া ফিরিয়া গেল।

আমি আগড়টি বন্ধ করিলাম। উঠান ঘিরিয়া সদ্য একটি পাতার পাঁচিল তৈয়ারি হইয়াছে। নারকেল পাতা কাটিয়া বাঁশের খাঁচায় সেট করিলে পাতার পাঁচিল তৈয়ারি হয়। মাঝখানে ডালডার টিনকাটা আগড়। আলকাতরা মাখানো কালো আগড়ে ইশকুল থেকে আনা চকখড়ি দিয়া একদিন লিখিয়া দিলাম। 'আমাদের বাড়ি'।

শুধু ওই কথায় জুত হইল না। বাড়ির সকলের নামগুলিও লেখা দরকার। ঠাকুরদার নাম লিখিলাম। বাবার নাম লিখিলাম। মায়ের নাম লিখিলাম, মা যে দেখিয়া বলিল, ছিঃ মেয়েদের নাম লিখতে নেই। আমার নাম তুই মুছে দে গোরা।

আমার বয়স তখন দশ বৎসর। তখন মায়ের কথা শুনিবার বয়স। নামটি আমি মুছিয়া দিলাম। আজ ২০০৭ সাল। পঞ্চাশ বছর আগে লেখা নামগুলি একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। ঘাড় ফিরাতেই দেখি, সেই নারকেল পাতার বেড়া। ওই তো সেই কালো আগড়। কিন্তু আশ্চর্য বড় যত্ন করিয়া লেখা নামগুলির একটিও নাই। তার বদলে অতদিন আগে না লেখা 'মহামায়া' নামটি এখন জ্বলজ্বল করিতেছে।